বৈদিকযুগে শিক্ষাব্যবস্থা (Education system in theVedic Period)

তপোবনবাসী দিব্যদ্রষ্টা, ঋষিদের ধ্যানকালে মন্ত্রসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। এক একজন ঋষি বা তাঁর বংশধরদের রচনা এক একটি মণ্ডলে সংগৃহীত হয়েছে। সেই দিব্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সহজ সরল জীবনযাপন করতেন, আহার করতেন ফলমূল ও পরিধান করতেন গাছের বল্কল। তাঁরা মন্ত্রগুলি উপলব্ধি করে সুরসংযোগে আবৃত্তি করতেন।

শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম ঃ

ঋগ্‌বেদের যুগে পাঠ্যক্রম ছিল শুধুমাত্র বেদাধ্যয়ন। 'বেদ'এর সঠিক আবৃত্তি ও অর্থবোধ ছিল একমাত্র শিক্ষা। নির্ভুল যতি, মাত্রা, ও ছন্দের সাহায্যে বেদের অধ্যয়ন শেখানো হত। শিক্ষার্থীদের বেদের আবৃত্তিকে মণ্ডুকের বা ব্যাংয়ের ডাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের ৭ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তের ৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে।

যদেষামন্যা অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমানঃ
সর্বং তদেষাং সমৃধেব পর্ব যৎসুবাচো বদথনাধ্যগ্নু।[১]

শিষ্য গুরুর ন্যায় যখন এ মণ্ডুক সকলের মধ্যে একটি অন্যের বাক্য অনুসরণ করে তখন (মণ্ডুকগণ! তোমরা সুন্দর শব্দ বিশিষ্ট হয়ে জলের উপর লম্ফ প্রদান করে, শব্দ কর....)।[১] এটির একটি সুন্দর অনুবাদকর্ম হল ঃ-

"One repeats the word of another
like students echoing the voice of the teacher;
together they form a chorus
when at rain fall loudly they croak."[১]

আবৃত্তিতে সঠিক উচ্চারণের ওপর জোর দেওয়া হত। শুধু উচ্চারণ নয় ঋক্ বা মন্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দের উপলব্ধি করার ওপরেও জোর দেওয়া হত। বেদের অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি না করে শুধুমাত্র আবৃত্তি বা মুখস্থকে চন্দনকাষ্ঠবাহী গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে "Slightest lapse in uttering a letter of a word of the vedic Mantra on the part of a teacher will spell utter ruin and disaster to him."

আদি সংস্কৃত ভাষায় লেখা অথর্ববেদে এসে আমরা ঐ সময়কার শিক্ষার একটি আদর্শ চিত্র পাই।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। প্রথমে উপনয়ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে শিষ্যকে গুরুগৃহে প্রবেশ করতে হত। উপনয়নের মধ্য দিয়ে ছাত্র বা শিষ্য দ্বিজত্ব লাভ করত। শতপথ ব্রাহ্মণের একাদশ কাণ্ডের ৫ ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের ১ম সূত্রে উল্লেখ আছে যে, আমি ব্রহ্মচর্যের জন্য এসেছি, আমাকে ব্রহ্মচারী হতে দেওয়া হোক (I have come for brahmacharya... Let me a Brahmacharin (student)। এরপর গুরু তাঁর নাম ধাম ও পরিচয় প্রভৃতি জিজ্ঞেস করে সন্তুষ্ট হলে তবেই তাকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করতেন। ছাত্ররূপে গ্রহণের পর আচার্য ও ছাত্রের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক বন্ধন তৈরি হত। আচার্যদেব শিষ্যকে সম্বোধন করে বলতেন, "তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে মিশে যাক, তোমার মন আমার মন এক হোক, আমার বাণীতে তুমি হৃদয়ে আনন্দ লাভ কর, তুমি আমার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্ত হও, আমার ভাবনা-চিন্তায় তুমি সমৃদ্ধ হও, তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধানত থাক ও আমি যখন উপদেশ দেব তুমি নিঃশব্দে তা গ্রহণ কর।" এভাবে দীক্ষাদানের পর আচার্য ব্রহ্মচারীকে বলতেন, "আজ থেকে তুমি ব্রহ্মচারী হলে ও ব্রহ্মচর্যের নিয়ম পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে। এই অমৃত পান কর। আপন

১. History and culture of the Indian people (Vol.1). Bharatiya Vidya Bhaban, 1952. P. 346

কর্তব্য পালন কর। প্রতিদিন যজ্ঞকুণ্ডে সমিধ দান কর। অগ্নির পবিত্র জ্যোতিতে নিজেকে উদ্ভাসিত কর। আচার্যের আজ্ঞাধীন হও। দিবানিদ্রা ত্যাগ কর। জিতেন্দ্রিয় হও।"

অথর্ববেদের ১১শ কাণ্ড ৩য় অনুবাকের ১ম সূক্তের ৩ নং ঋক্-এ বলা হয়েছে।

আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃনুতে গর্ভমন্তঃ।

তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভি সংযন্তি দেবাঃ"

আচার্য ব্রহ্মচারীকে আপন বিদ্যাময় শরীরের মধ্যে গর্ভসঞ্চার করে তিনরাত্রি নিজ উদরে ধারণ করেন। চতুর্থ দিবসে বিদ্যাময় শরীর থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মচারীকে দেখার জন্য দেবতারা তার অভিমুখে আসেন। –"By laying his right hand on (the pupil) teacher becomes pregnant (with him). In the third night he is born as a savitri... therefore he should reach the Brahmana at once. " এই অনুষ্ঠানকে মেধাজনন (Medhajanana) বা সাবিত্রীব্রত অনুষ্ঠানও বলা হয়। A.S Altekar বলেছেন, "The Preceptor performed the Medhajanana ritual for sharpening the memory, intellect and grasping power of the student."

ছাত্রগণ তাদের শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পূর্বে বেশ কয়েক বৎসর (সাধারণত বারো বৎসর) গুরুগৃহেই বাস করত।

এই সময়ে ছাত্রদের কতকগুলি চিহ্নধারণ করতে হত—যথা অজিন বা হরিণাদিপশুর ছাল, বল্কল বা গাছের ছাল, দণ্ড বা যষ্টি, মেখলা ঘাসের কোমরবন্ধনী, উপবীত সূত্র এবং জটা। এই সময় তাঁর ভিক্ষা সংগ্রহ প্রভৃতি কতকগুলি বাইরের কর্তব্যও ছিল, পড়াশোনা, ধ্যান ও তপশ্চর্যা এবং বিশ্রাম প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ করণীয় কৃত্য ত ছিলই। এছাড়া যজ্ঞের জন্য সমিধ (কাষ্ঠ) সংগ্রহ, গোচারণ, হোমকুণ্ডের অগ্নি সংরক্ষণ ও ভিক্ষান্ন সহ পানীয় জলও সংগ্রহ করতে হত।

অনধ্যায় কাল ঃ

সাধারণভাবে মেঘলা দিনে, বা খুব ঝড়োবাতাস প্রবাহিত হলে বেদাধ্যয়ন স্থগিত থাকত। উন্মুক্তস্থানে, বৃক্ষতলে, গোশালার কাছে পঠনপাঠন নিষিদ্ধ ছিল। অসময়ে বজ্রপাত, অবিরল বৃষ্টি, কুয়াশা, ধূলিঝড় প্রভৃতি হলে পঠনপাঠন বন্ধ থাকত, খেঁকশিয়াল, নেকড়ে বাঘ, গাধা, কুকুর ও পেঁচার ডাক শোনা গেলে কিছুক্ষণের জন্য বেদের পঠনপাঠন বন্ধ থাকত। তবে মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে, অনধ্যায় দিনে বেদাঙ্গের পঠনপাঠনে বাধা নেই।

গুরু-শিষ্য বা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ঃ

ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি আচার্য ও শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। যান্ত্রিক ও গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে বর্তমান কালে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক মোটেই ঘনিষ্ঠ নয়। এটা একটা কোনো বড়ো সভায় একজন বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্কের মতো। এই জাতীয় শিক্ষায় ছাত্রশিক্ষকের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের কোনো স্থান নেই, শিক্ষার আদানপ্রদানের মধ্যে যে হৃদয়ের একটা ভালোবাসা থাকে, তা নেই। আসলে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ এই দুয়ের মধুর সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে শিক্ষার যথার্থ পরিপূর্ণতা।

এজন্যই শিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষ সব সময়েই আচার্য এবং ছাত্রের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

গুরু শিষ্যের উপরোক্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে বৈদিক যুগের শিক্ষা পদ্ধতির আরো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তখনকার দিনের শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলকভাবেই গুরুকুলবাসের শিক্ষা। বিদ্যার্থীকে তার শিক্ষাজীবনের সবটুকু সময়ই তার গুরুগৃহে গুরুর পরিবারের একজন আবাসিক হয়ে বাস করতে হত। শুধু তাই নয়, নিজের গৃহ মনে করেই, একেবারেই গুরুপুত্রের মতো বাস করতে হত। শিষ্য শুধু তাঁর গুরুর মৌখিক উপদেশ বা পুথিগত ভাষণ থেকেই শিক্ষালাভ করত না, বরং সে শিক্ষালাভ করত গুরুর প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শকে দেখে, যে আদর্শ প্রতিফলিত হত গুরুর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি কার্যে। গুরুগৃহবাসের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল তাঁর কাছে শিক্ষণীয়।

নিঃশুল্ক বা অবৈতনিক শিক্ষা ঃ

গুরুগৃহের শিক্ষা ছিল পুরোপুরি নিঃশুল্ক বা অবৈতনিক। ছাত্রের শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষককে কোনো বেতন দিতে হত না। বরং শিক্ষকরা এভাবে ছাত্রদের বাসস্থান, খাদ্য, পোশাক প্রভৃতি দিয়ে শিক্ষাদান করাকে বেশ সম্মানজনক কাজ বলে ভাবতেন। এটাকে তাঁরা বিশেষ সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ ঃ

বৈদিক ভারতে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে দুটি ব্যাপার আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে ঐ সময় নারীদের বেদ পাঠে অধিকার ছিল কিনা এবং তাদের উপনয়ন কর্ম অনুষ্ঠিত হত কিনা। প্রথমেই আমরা বিচার করে দেখবো **তাদের বেদপাঠে অধিকার ছিল কিনা?**

অথর্ববেদে (১১,৫,১৮), যথাসম্ভব স্পষ্টভাবেই, বলা হয়েছে কুমারী কন্যা ব্রহ্মচর্য অথবা বেদ অধ্যয়নের দ্বারাই তরুণ যুবাপতি লাভ করে থাকে—"ব্রহ্মচর্যেন কন্যা যুবানম্ বিন্দতে পতিম্।" এই মন্ত্রটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটাই একমাত্র বৈদিক উদ্ধৃতি—যেখানে নারীর ব্রহ্মচর্য ও বেদাধ্যয়নের উল্লেখ স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। কেবল চারটি বেদের মধ্যে একমাত্র অথর্ববেদেই এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রহ্মচর্য প্রথাটিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে সংহিতাকার হারীত নারীদের বেদ অধ্যয়নের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন।

আবার আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৩,৮,১১) সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে গুরুগৃহের পাঠ শেষ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে (অবভৃত স্নান প্রসঙ্গে) একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। এই অনুষ্ঠানে দুই হাতের তালুতে তৈল জাতীয় স্নেহ পদার্থ ঘসে ঘসে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মচারী) তার মুখে, ক্ষত্রিয় তার বাহুতে, বৈশ্য তার পেটে, নারী (ব্রহ্মচারিণী ছাত্রী) তার নিম্নাঙ্গে এবং শ্রমজীবীগণ (শূদ্রেরা) তাদের উরুদেশে মাখবে। এ থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, বৈদিক যুগে নারীদেরও বেদবিদ্যার অধিকার ছিল। আবার হারীতের মতানুসারে বালিকা ব্রহ্মচারিণীর সমাবর্তন ক্রিয়ানুষ্ঠানটি তার রজঃস্বলা হওয়ার পূর্বেই অনুষ্ঠিত হত। (প্রাগ্‌রজসঃ সমাবর্তনম্)"। বিস্তৃত আলোচনার জন্য **'প্রাচীন ভারতের নারীশিক্ষা'** অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এবারে নারীর উপনয়ন সংস্কারের অধিকার প্রসঙ্গ ঃ

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, স্মৃতিকার কাত্যায়ন, মাধবাচার্যের 'মালা বিস্তার' প্রভৃতি গ্রন্থে নারীদের উপনয়নের কথা স্বীকার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে যম ও হারীত এই প্রসিদ্ধ স্মৃতিকারদ্বয়ের নিম্নলিখিত দুটি শ্লোক থেকে এ বিষয়ে বেশ কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। এটি 'বীর মিত্রোদয়সংস্কার প্রকাশ' (পৃ: ৪০২-৩) গ্রন্থে যম কর্তৃক উদ্ধৃত—

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনস্তথা"
পিতাপিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনাম অধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষ-চর্যা বিধীয়তে।
বর্জয়েদ অজিনাশ্ভীরম্ জটাধারণমেব চ।।"

অর্থাৎ পুরাকালে কুমারীদের মুঞ্জীবন্ধনের নিয়ম ছিল, বেদাধ্যয়ন এবং সাবিত্রী (গায়ত্রী) উচ্চারণের (দীক্ষার) ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে তাদের পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কেউ তাদের অধ্যাপনা করবে না। কন্যার ভিক্ষাচর্যাও নিজের (পিতৃগৃহেই) হবে। কন্যাকে মৃগচর্ম বা জটাদিধারণ করতে হবে না।

আবার হারীতের স্মৃতি থেকে জানা যায়, "দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যো-বধ্বাশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নম্ অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্যা ইতি। সদ্যোবধূনাম্তুপাসিতে বিবাহে কথঞ্চিদ্ উপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহাঃ কার্যাঃ।"

(সংস্কার রত্নমালা, ১ম খণ্ড, পৃ:১৬৫) এ থেকে বোঝা যায়, নারীরা আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপন করতে ইচ্ছা করুন, বা বিবাহিত জীবনই যাপন করুন—তাঁদের উপনয়ন সংস্কারের অধিকার ছিল। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীদের বেদপাঠ, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি আরও অধিকতর বিষয়ে অধিকার ছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, বৈদিক ভারতে নারীগণও দীক্ষান্তে তাঁদের গুরুগৃহে বাস করতেন, ব্রহ্মচারিণীদের উপযোগী বাহ্যচিহ্নাদি ধারণ করতেন ও নিত্যকর্মাদির অনুষ্ঠান করতেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে এই সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

গুরুগৃহে শিষ্যের পালনীয় বিধি ঃ

(১) ব্রহ্মচারীকে অসংস্কৃত ভূমিতে শয়ন করতে হত।
(২) গুরুর শয্যা গ্রহণের পর শিষ্যকে শয্যা গ্রহণ করতে হত।
(৩) গুরুর শয্যা ত্যাগের পূর্বে শিষ্যকে শয্যাত্যাগ করে অপেক্ষা করতে হত।
(৪) প্রণামকালে দক্ষিণহস্ত দিয়ে গুরুর দক্ষিণচরণ ও বামহস্ত দিয়ে বামচরণ স্পর্শ করতে হত।
(৫) আপন নাম গোত্র বলে গুরুকে অভিবাদন করতে হত।
(৬) বসে, শুয়ে শুয়ে, বা খেতে খেতে বা অন্যদিকে চেয়ে গুরুর সঙ্গে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ ছিল।
(৭) গুরু গমনশীল হলে শিষ্যকেও তার পিছন পিছন গিয়ে কথা বলতে হত।
(৮) গুরুর দৃষ্টিপথের মধ্যে যেখানে সেখানে বসা যেত না।
(৯) গুরুকে শ্রী, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধিযুক্ত করে অভিবাদন জানাতে হত। গুরু সাক্ষাতে না থাকলেও তাঁর নাম ধরা চলত না। কেবল নাম না বলে গুরুমশায়, আচার্যমহাশয়, উপাধ্যায় মহাশয়, ইত্যাদি ভাষায় পরিচয় দিতে হত।

ছিলেন।

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) বেদই ছিল শিক্ষার মূল ও শিক্ষার ধারক ও বাহক।

(২) জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত ছিল।

(৩) উপনয়ন দীক্ষার পর ছাত্রদের গুরুগৃহে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে জীবনযাপন করতে হত।

(৪) ঐ সময় শিক্ষায় রাজা বা শাসকদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আচার্যদের কাছে দীক্ষাগ্রহণ একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল।

(৫) নৈতিকচরিত্র সম্পন্ন ছাত্ররাই গুরুগৃহে বাস করার অধিকার পেত।

(৬) জনগণের দান ও ভালবাসায় শিক্ষকদের সমস্ত খরচ নির্বাহ হত।

(৭) শিক্ষকের বাসগৃহই ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। ছাত্র ও শিক্ষক একসঙ্গে বাস করত এবং তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল।

(৮) ব্রহ্মচর্য পালন ছিল আবশ্যিক। ছাত্রদের পবিত্রভাবে গুরুগৃহে দিন যাপন করতে হত।

(৯) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল। গুরুগৃহে উচ্চশ্রেণির ছাত্ররা নীচুশ্রেণির ছাত্রদের পড়াত।

(১০) বেদ, বেদাঙ্গ ছাড়াও দর্শন, ব্যাকরণ, ধর্ম, সংস্কৃত, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির ওপর জোর দেওয়া হত।

(১১) সমাজে নারীদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হত ও তাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হত।

(১২) ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদের কোনো বালাই ছিল না বলে সমাজের সব স্তরের ছাত্ররাই একই সঙ্গে গুরুর পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

(১৩) বিধিবদ্ধ পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গুরুর বিবেচনাই ছিল চূড়ান্ত ব্যাপার।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা

(Brahmanic system of Education)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি • সংঘ বা সভা • বিদ্যারম্ভ • ব্রহ্মচারীর দৈনন্দিন জীবনচর্যা • পাঠ্যবিষয় • ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের শিক্ষা • শিক্ষাদান পদ্ধতি • ছাত্রের এবং আচার্যের শ্রেণিবিভাগ • শিক্ষাবর্ষ • সমাবর্তন • ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার অবদান • বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার আদর্শ কতখানি গ্রহণযোগ্য • ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি •

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ঃ

সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো নানা প্রশাসনিক নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। আর্যসংস্কৃতির মধ্যে বৈদেশিক প্রভাব থাকলেও তা ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বিভক্ত ছিল না। এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সুসংগঠিত (well-organised) এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে গতিশীল। এখন ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার লক্ষ্যগুলি আলোচনা করা হচ্ছে—

○ **(১) আত্মার মুক্তি ঃ** আত্মার বন্ধন মোচন করে মানুষকে মুক্তি লাভ করতে হবে—এই ছিল ব্রাহ্মণ্যযুগের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালে প্রবর্তিত চতুরাশ্রম মোক্ষলাভের চারটি স্তম্ভ স্বরূপ। এই চারটি স্তম্ভ হল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বেদ-পরবর্তীকালে সমাজে গুণকর্মের ওপর ভিত্তি করেই জাতিবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। এর পিছনে অবশ্য কিছু সামাজিক কারণও ছিল।

○ **(২) পরাবিদ্যার অনুশীলন ঃ** পরাবিদ্যার অনুশীলন ছাড়া মুক্তিলাভ অসম্ভব। এই পরাবিদ্যা মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ করে তোলে। অপরাবিদ্যা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না বরং সহস্র বন্ধনে বেঁধে ফেলে। তাই পরাবিদ্যা লাভ ছিল ব্রাহ্মণ শিক্ষার লক্ষ্য।

○ **(৩) ধ্যান ও মনন ঃ** এই পরাবিদ্যা লাভের জন্য তীব্র ধ্যান ও মননের প্রয়োজন। পরমব্রহ্মের চিন্তা ও অনুশীলন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্য।

○ **(৪) দেহ ও মনের বিকাশ ঃ** এই শিক্ষাব্যবস্থায় নানা কাজকর্মের দ্বারা দেহকে ও সদ্‌চিন্তার দ্বারা মনকে সুস্থ রাখা হত। দেহ ও মনের সুস্থ সুষম বিকাশ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

○ **(৫) পরমতম সত্তার উপলব্ধি ঃ** প্রত্যেকটি মানুষ যে এক পরম সত্তার অংশ এই সত্যটিকে উপলব্ধি করতে হবে। এই পরম সত্তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করে তুলতে পারলে এই জড় জগতের দুঃখ, জরা, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ঃ

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদগুলি থেকে বেদ-পরবর্তী সময়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কথা জানা যায়। বেদ ছাড়াও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদগুলি শিক্ষা দেবার জন্য চরণ, পরিষদ, কুল, গোত্র প্রভৃতি নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। আগেই বলা হয়েছে, বেদ শ্রুতিনির্ভর। যাঁরা যে বেদের ওপর সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি বা মুখস্থ করতে পারত তাঁরাই সেই বেদের শাখারূপে পরিগণিত হতেন। তাদেরই অনুসরণকারীদের 'চরণ' নামে অভিহিত করা হত। Charana defined as "a number of men who are pledged to the reading of a certain sakha of the veda and who have in this manner become one body. Thus while the sakhas denoted the texts, their propagators or Pravartakas were the charanas."[১] মধুসূদন সরস্বতীর মতে প্রত্যেকটি বেদের কয়েকটি করে শাখা আছে এবং পঠনের বিভিন্নতা অনুসারে শাখার বিভিন্নতা দেখা যেত।

পরিষদগুলি ছিল বিশেষজ্ঞদের সমাবেশ কেন্দ্র (a gathering of specialists)। স্মৃতিশাস্ত্র বা শাস্ত্রগ্রন্থ ঘটিত কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে এই সব পরিষদই সেগুলির মীমাংসা করত। উপনিষদে 'পরিষদ' সম্পর্কে বলা হয়েছে "an assemblage of advisers in questions of Philosophy"[২] এবং এর ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে "Although its chief functian was to advise the king on intricate and disputed points of Law, it was probably a general body of advisers on all matters, religious, political and Judicial."[৩]

স্মৃতিকার বশিষ্ঠ ও বৌধায়নের মতে 'পরিষদ' দশজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এই দশজনের মধ্যে চারজন হবেন বেদজ্ঞ অর্থাৎ যারা বেদপাঠ সাঙ্গ করেছেন (অন্তত একটি বেদে), অপর তিনজন সদস্য হবেন ছাত্র, গৃহস্থ, তপস্বী বা যোগী, বাকি তিনজনের একজন হবেন মীমাংসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, একজন বেদাঙ্গে পারদর্শী ও অপরজন স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এই দশজন সদস্যই হবেন সুশিক্ষিত (well instructed), যুক্তিশীল (skilled in reasoning) এবং নির্লোভ (free from covetousness)। আপার স্মৃতিকার গৌতমের মত আলাদা। তাঁর মতে দশজন সদস্যের মধ্যে চারজন হবেন বেদজ্ঞ, তিনজন হবেন এক এক বর্ণের ও অপর তিনজন হবেন স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

---

১. R.K. Mookerji-Ancient Indian Education, Motilal Banarsidas,1989, P. 80

২. ibid P. 82

৩. R.C Mazumder ed . Hist. and culture of Indian people (Vol.-1) P. 484

শিক্ষাদান পদ্ধতি (Method of Teaching) ঃ

ব্রাহ্মণ্য যুগের পাঠপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি স্তরভেদ পাওয়া যায়। সেগুলি হল—

(১) উপক্রম—এটি বেদ পাঠ পর্বের পূর্বের এক অনুষ্ঠান। প্রথমে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে পাঠের উপক্রম বা প্রস্তুতি করা হত।

(২) অভ্যাস—যে বিষয়টি বা বিষয়বস্তুটি পড়ানো হল সেটিরই আবৃত্তি বা অভ্যাস করানো হত।

(৩) অপূর্বতা—এই স্তরে বিষয়বস্তু বোঝাবার চেষ্টা করতেন আচার্য।

(৪) ফল—এই স্তরে বিষয়বস্তুর উপলব্ধির পরীক্ষা করা হত।

(৫) অর্থবাদ—এই স্তরে বেদের ভাষ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ পাঠ করানো হত।

(৬) উপপত্তি—এই স্তরে ছাত্ররা বিষয়বস্তুর মর্মার্থ গ্রহণে সমর্থ হত।

এছাড়া কোনো কোনো গ্রন্থে নিম্নোক্ত পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে—

(১) উপক্রম—পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে পাঠের উপক্রম করা হত।

(২) শুশ্রূষা—আচার্যের পাঠদান শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করাই হল শুশ্রূষা (to create eagerness to listen to the words of the teacher).

(৩) শ্রবণ—শিক্ষার্থী কর্তৃক বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ (appreciation by the ears the lessons of the teacher)

(৪) গ্রহণ—বিষয়বস্তুকে উপলব্ধির চেষ্টা(appreciation of the teacher's words)

(৫) ধারণ (Retention)—অভ্যাসের দ্বারা বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করা।
(৬) উহাপোহ (discussion)—আলোচনার দ্বারা বিষয়বস্তুর উপলব্ধির প্রয়াস। শিক্ষকরাও এই আলোচনায় যোগ দিতেন।
(৭) বিজ্ঞান—আচার্যের দেওয়া বিষয়বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা (appreciation of the full knowledge of the Meaning conveyed by the teacher). একে অর্থাভিজ্ঞানও বলে।
(৮) তত্ত্বাভিনিবেশ—আচার্য প্রদত্ত পাঠের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধির চেষ্টা (Comprehension of the underlying truth of guru's words)

'কামন্দকী' নীতিসার'-এ বলা হয়েছে—
"শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণম্ ধারণম্ তথা।
উহাপোহার্থ বিজ্ঞানম্ তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগণাঃ"

Dhiguna include the follwing qualities :

(১) শুশ্রূষা—(Susrusha) desire to listen
(২) শ্রবণম্—act or Process of hearing
(৩) গ্রহণম্—accepting, taking in
(৪) ধারণম্—digestion of what has been taken in
(৫) উহাপোহ—discussion
(৬) অর্থবিজ্ঞানম্—Grasping the correct sense
(৭) তত্ত্বজ্ঞানম্—knowledge of profound truth (সত্যের ধারণা),

গল্পের মাধ্যমে বা গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাই পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কথা প্রথমেই বলা হয়েছে—'কথাচ্ছলেন বালানাম্'। উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্বকে প্রাঞ্জল করে নেবার জন্য গল্পের সাহায্য নেওয়া হত। জটিল ও নীরস বিষয়কে সহজ করে নেবার পক্ষে এই পদ্ধতির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

○ **প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি** ঃ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে প্রশ্নিন (প্রশ্নকর্তা), অভিপ্রশ্নিন (প্রশ্নের পরিপূরক) এবং প্রশ্নবিবাক (উত্তরদাতা)—এই তিনজনের মাধ্যমে পাঠদান চলতো ও ছাত্রদের কাছে বিষয়বস্তু পরিষ্কার হয়ে যেত।

○ **পাদপূরণ পদ্ধতি** ঃ পঠন পাঠনকালে ছাত্রদের চারটি পাদ পূরণ করতে হত। একটি পাদগুরু পূরণ করতেন দ্বিতীয়টি সতীর্থদের সমবেত চেষ্টায় পূর্ণ হত। তৃতীয়টি শিক্ষার্থীর একক প্রচেষ্টায় পূর্ণ হত আর চতুর্থ পাদ পূরণে আর কারও সাহায্য নেবার প্রয়োজন বোধ হত না।

ছাত্রের শ্রেণিবিভাগ ঃ

প্রাচীন যুগে দুরকম ছাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়—উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক। উপকুর্বাণ শ্রেণির ছাত্ররা গুরুগৃহে পাঠ শেষ করে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে গার্হস্থ্য জীবন শুরু করতেন। অপরদিকে গুরুর বিদ্যাবংশধর নৈষ্ঠিক ছাত্ররা আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন না—সারাজীবন ত্যাগের আদর্শে উদ্‌বোধিত হয়ে চির কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করে আচার্য

গৃহেই বাস করতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে শ্রুতকীর্তি হতেন। উপকুর্বাণ ছাত্রদের গুরুগৃহ থেকে বিদায় নেবার কালে গুরুকে কিছু দক্ষিণা দিতে হত। দরিদ্র ছাত্ররা সামান্য শাকসব্জি দিয়েও দক্ষিণা দান করতেন।

আচার্যের শ্রেণিবিভাগ ঃ

গুরুকুলবাসী আচার্য ছাড়াও আর এক শ্রেণির গ্রামমান আচার্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা 'চরক' নামে পরিচিত। এই শ্রেণির আচার্যগণ স্থান-স্থানান্তরে গিয়ে উৎসুক ছাত্রদের বিদ্যাদান করতেন। এছাড়া আরো কয়েক প্রকার আচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন—শ্রোত্রিয়, মহাশ্রোত্রিয়, তাপস, প্রবক্তা ও বাতশরণ। বেদ-আবৃত্তিতে দক্ষ আচার্যদের বলা হত শ্রোত্রিয় (specialists in vedic recitation was called a stotriya)। বেদচর্চা ও ধ্যানের ফলে রাগাদি বৃত্তি দূরীভূত হলে তাঁদের বলা হত মহাশ্রোত্রিয়। বেদসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যাকারীদের বলা হত প্রবক্তা ও ঋগ্বেদে বাতশরণ নামে এক যোগী সম্প্রদায়ের আচার্যের উল্লেখ আছে।

শিক্ষাবর্ষ (Annual term) or Academic session ঃ

বর্ষাকালে প্রকৃতি যখন শান্ত থাকত তখনই বেদের অধ্যয়ন কাল আরম্ভ হত। আষাঢ়, শ্রাবণ বা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে আরম্ভ হত বেদের পাঠনপাঠন। (The Commencement of Vedic study must take place on the full moon day either of the months of Asardha, sravana and Bhadra ...it was then that the herbs appeared amid the gold grass and all nature smiled with the pulsation of a fresh life. This was also the commencement of the Vedic year."[১] কোনো কোনো সংহিতায় শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে বেদাধ্যয়নের আরম্ভ বা 'উপাকর্ম' নামক অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে 'উপাকর্ম' অনুষ্ঠান শুরু হত। ঋগ্বেদীয়গণের সাবিত্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, প্রজ্ঞা, ধারণা ও বেদের ঋষিদের আহ্বান করে অনুষ্ঠান আরম্ভ হত। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের প্রথম ও শেষ স্তবক উচ্চারণ করে ও অগ্নির উদ্দেশে ঘৃতাদি নিবেদন করা হত। যজুর্বেদ ও সামবেদীয় ছাত্ররা সংশ্লিষ্ট বেদ ও ঋষিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করতেন। এরপর সাড়ে চার মাস বেদের পাঠনপাঠন চলত। এরপর পৌষের পূর্ণিমা তিথিতে উৎসর্জন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। ...study for the four months and a half and then perform the utsarga (a dedicatory rite performed annually after the Completion of the veda ... the rite of the utsarga shall be done outside the town..." এই উৎসর্গ বা উৎসর্জন অনুষ্ঠানের পর গুরুর পঠন ক্রিয়া বন্ধ থাকলেও ছাত্রদের প্রতিটি শুক্লপক্ষে বেদ এবং কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গের ও পুরাণের অনুশীলন করতে হত। এরপর আবার 'শ্রাবণীপূর্ণিমা' থেকে বেদের পাঠনপাঠন শুরু হত। 'শ্রাবণী' অনুষ্ঠানে নূতন যজ্ঞোপবীত গ্রহণ, মেখলা ও দণ্ড পরিবর্তন করতে হত।

---

১. S.K. Das-The Education System of Ancient Hindus. P: 128

'উপাকর্ম' অনুষ্ঠানে আর একটি বিশেষ দিকের প্রতি নজর দেওয়া হত। গুরুগৃহ থেকে পাঠ সাঙ্গ করে যে সব শিক্ষার্থী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করত তারা অনেকে প্রয়োজনবোধে এই সময়ে পুরনো পাঠের অনুশীলন করতে পারতো। তবে তারা গুরুগৃহে থাকবার অনুমতি পেতো না। শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে ভাদ্র পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনের পূর্ণিমা, আশ্বিনের পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা থেকে মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা ও পৌষের প্রথমার্ধ অর্থাৎ এই সাড়ে চার মাস বেদ পঠন পাঠন চলত। পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়ের বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষাবর্ষ একবছরের হয়ে যায়। তবে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী উৎসর্জন অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পরও বৈদিক পঠন পাঠন চলত। এই নিয়ম মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

সমাবর্তন (Samavartana) ঃ

শিক্ষাশেষে অনুষ্ঠিত হত সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এই সমাবর্তন হল ব্রহ্মচর্যের পরিসমাপ্তি (end of Brahmacharya period) অনুষ্ঠান। বলা হয়েছে "Samavartana literally means returning, it refers to the return of the student to his home after finishing the course at the teacher's home." যারাই বেদ বিদ্যা পাঠ সমাপন করেছেন তারাই সমাবর্তনের যোগ্য হতেন। তিন প্রকারের স্নাতকের উল্লেখ আছে। যারা ঐ কালের মধ্যে বেদপাঠ সমাপ্ত করলেও ব্রত অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমাপ্ত করতে পারেননি—তারা বিদ্যাস্নাতক, যারা বেদপাঠ সমাপ্ত না করে শুধু ব্রত সমাপন করেছেন—তারা ব্রতস্নাতক আর যারা বেদপাঠ ও ব্রত দুটিই সমাপন করেছেন তাঁরা বিদ্যাব্রতস্নাতক রূপে অভিহিত হতেন।

এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হত কয়েকটি পর্বে। এর জন্য একটি শুভদিন নির্দিষ্ট করা হত ও স্নাতকউদ্দিষ্ট ছাত্রটিকে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা হত। প্রভাত সূর্যের দ্যুতি প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত ছাত্রটিকে যেন ম্লান করতে না পারে—এই বিশ্বাসে তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হত। মধ্যাহ্নে তাকে ঘর থেকে বার করে তার মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ প্রভৃতি ফেলে দেওয়া হত ও দণ্ড, মেখলা, অজিন প্রভৃতি খুলে জলে বিসর্জন দেওয়া হত। স্নান শেষে আচার্য মন্ত্রোচ্চারণ করে তার হাতে নতুন বস্ত্র, দুটি কর্ণ বলয়, মালা (স্রক), শিরস্ত্রাণ, ছাতা, পাদুকা প্রভৃতি দান করতেন। এবং আগে তাকে গন্ধ ও চন্দন মিশ্রিত জলে স্নান করতে হত। দীর্ঘসংযত কঠিন জীবনের অবসান ঘটলো। এরপর ছাত্রের অভিভাবক দুপ্রস্থ উপর্যুক্ত দ্রব্যগুলি নিয়ে এসে একপ্রস্থ ছাত্রকে ও অন্যপ্রস্থ আচার্যকে দিতেন। এরপর একটি যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত ও সেখানে প্রার্থনা জানানো হত। তখন আচার্য ছাত্রটিকে মধুপর্ক দানে সম্মানিত করে বিদায় দিতেন। নিম্নোক্ত উপদেশগুলি দান করে আচার্যদেব তার ছাত্রকে বিদায় অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাতেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রথম শিক্ষা বল্লাধ্যায়ের একাদশ অনুবাকে সমাবর্তন ভাষণের উল্লেখ আছে। সেটি হল—

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার অবদান ঃ

○ ১. **সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঃ** শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও তার ব্যক্তিসত্তার সার্বিক বিকাশের ওপর নজর দেওয়া হত। কেননা তখন মনে করা হত যথার্থভাবে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ না ঘটলে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এই ব্যক্তিসত্তার বিকাশ যাতে কোনোমতেই না বিঘ্নিত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হত।

○ ২. **ব্যক্তিমুখী শিক্ষার প্রবর্তন ঃ** প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গুরু তার ব্যক্তিগত রুচি, চাহিদা, সামর্থ্য, মানসিক ক্ষমতা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে শিক্ষাদান করতেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানলাভ করতে পারতো। গুরু প্রত্যেকটি ছাত্রের শিক্ষার অগ্রগতি অবহিত হতে পারতেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ডাল্টন প্ল্যান, মরিশন প্ল্যান, উইনেটকা প্ল্যান প্রভৃতি ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়েই গড়ে উঠেছে।

○ ৩. **ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সহায়ক ঃ** শিক্ষার পাঠ্যক্রম এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সাথে সাথে ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করা যায়। তাই বলা হয়েছে—(it aimed at providing practical knowledge for the future responsibilities of life).

○ ৪. **শিক্ষার সর্বজনীনতা ঃ** সেকালে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানকে পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতির শিক্ষালাভের অধিকার ছিল। শিক্ষার একটা উন্মুক্ত হাওয়া সেকালে ছড়িয়ে পড়েছিল।

○ ৫. **ব্রহ্মচর্য ও কঠোর আত্মসংযমের শিক্ষা ঃ** শিক্ষার্থীর সুদীর্ঘ ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য ও আত্মসংযমের শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। ব্রহ্মচর্য রক্ষার ফলে মানসিক ও প্রশান্তি লাভ হত। এই মানসিক স্থৈর্য, সংযম শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক হত।

○ ৬. **উপযুক্ত সময়ে শিক্ষা ঃ** প্রাচীন আচার্যরা বুঝতেন ঠিক কোন্ সময়ে শিক্ষাদান সঙ্গত। সাধারণভাবে আটবছরে ব্রাহ্মণদের উপনয়ন দীক্ষার পরই গুরুগৃহে যেতে হত। ধীরে ধীরে তারা সমগ্র পাঠ্যক্রমটিই অধিগত করতে পারত। বলা হয়েছে 'The Studentship period was Co-eval and Co-terminous with educational period)। পাঠ্যবস্তুর বিস্মরণ মেনে নেওয়া হত না ও এটিকে পাপ বলে গণ্য করা হত।

○ ৭. **দৈহিক শাস্তিদানের বিরোধিতা ঃ** প্রাচীন স্মৃতিকারগণ শিক্ষার্থীদের দৈহিক শাস্তিদানের বিরোধিতা করেছেন। আপস্তম্ব, মনু গৌতম প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ দৈহিক শাস্তিদানের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মানসিক শাস্তির উপর জোর দিয়েছেন। আপস্তম্ব বিধান

দিয়েছেন, "a teacher should try to improve refractory students by banishing them from his presence or by imposing fast." মনু স্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, "অতি কঠোরভাবে তাড়না ব্যতিরেকেই শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবে, ... তিনি শিষ্যের প্রতি মধুর ও সত্যবাক্য প্রয়োগ করিবে, (বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষা...২ / ১৫৯) গৌতম সংহিতার ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "শিষ্যা শিষ্টিরবধেন্যাশস্ত্রো রজ্জুবেণু বিদলাভ্যাং তনুভ্যামন্যেন ত্বন রাজাজ্ঞা শাস্যঃ।" অর্থাৎ শিষ্যকে বধযোগ্য আঘাত না করিয়া শাসন করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে অতিমৃদু, দলহীন বংশদণ্ড বা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিবে। অন্য বস্তু দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন।"

○ ৮. আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা : প্রাচীনকালে শিক্ষাগ্রহণের সম্পূর্ণ কালটিই গুরুগৃহে কাটাতে হত। আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থার যে এক বিশেষ তাৎপর্য আছে তা সব শিক্ষাবিদ স্বীকার করেছেন। গুরুগৃহে থাকতে থাকতে তাদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতো। এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেহ মনের সার্বিক বিকাশ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মনে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পঠনপাঠনে আগ্রহী হয়ে উঠত।

○ ৯. গুরুশিষ্যের সম্পর্ক : প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও প্রীতিপূর্ণ ছিল। অধ্যাপনাকে গুরুরা অর্থকরী বৃত্তিরূপে মেনে নিতে পারত না। একদিকে ছাত্রদের গুরুর প্রতি তাঁর যেমন শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা থাকত তেমনি তাঁরাও শিষ্যদের আপন সন্তানের মতো দেখতেন। এর ফলে উভয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড় হয়ে উঠত।

○ ১০. চরিত্র গঠন ও সুঅভ্যাস গঠনের শিক্ষা : গুরুগৃহে শিক্ষার্থীদের শুধু পঠন পাঠনের দিকে জোর দেওয়া হত না, চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেওয়া হত। জীবন সম্পর্কে একটি আদর্শবোধ সঞ্চারিত করা হত ও শিক্ষার সঙ্গে চরিত্র গঠন ও সুঅভ্যাস অনুশীলনের চেষ্টা করা হত। এর ফলে ভবিষ্যতে তারা উপযুক্ত নাগরিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হত।

○ ১১. প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান : শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির মাধুর্যময় পরিবেশে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল। দেহে মনে প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সাহচর্যে ছাত্ররা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে শিক্ষা লাভ করত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

○ ১২. বংশগতির ভিত্তিতে শিক্ষাদান : শিক্ষাক্ষেত্রে যে বংশগতি (Heredity) এর একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে-এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদ্‌গণ একমত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি জাতিকেই শিক্ষাদান করা হত। প্রত্যেকটি জাতি তাদের বৃত্তিভিত্তিকশিক্ষা গ্রহণ করতো ও অনুশীলনের ফলে তারা কোনো কোনো বৃত্তিতে পারঙ্গম হয়ে উঠত।

○ ১৩. গৃহপরিবেশ থেকে সম্পর্কহীনতা : গৃহ পরিবেশে থাকার ফলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় গৃহের বা পরিবেশের সুখদুঃখ, অভাব অভিযোগ বা নানা সাংসারিক সমস্যায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হয়। কোনো কোনো সময় এতে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। একনিষ্ঠভাবে পঠনপাঠনের জন্য গুরুগৃহে বা অন্তেবাস একান্ত প্রয়োজন।

অষ্টম অধ্যায়

বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ
(Concept of Buddhist Education)

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমি ● ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা ● বৌদ্ধশিক্ষার মূলনীতি ও রীতিপদ্ধতি ● বৌদ্ধবিহারে শিক্ষাদান পদ্ধতি ● বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা ● বৌদ্ধশিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব ● বৌদ্ধশিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভাবধারা ●

পটভূমি ঃ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতে বৈদিক ধর্মের জটিলতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সূচনা হয়েছিল। যাগযজ্ঞ, পশু-বলি, সমাজে পুরোহিত শ্রেণির প্রাধান্য, শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির অনুশাসন, আন্তরিকতাশূন্য বর্ণভেদ, অর্থহীন অনাড়ম্বর বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের বাহুল্য, বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সরল অনাড়ম্বর ভক্তিময় পবিত্র ভাবকে নষ্ট করে দিয়েছিল। নিম্নবর্ণীয়দের প্রতি পুরোহিত সমাজের ঘৃণার ভাব সমাজ জীবনে এক বিরাট অসন্তোষ ডেকে এনেছিল। আর্যদের সমাজ জীবনে অনার্য বা ব্রাত্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তাদের স্থান ছিল একেবারেই নগণ্য। তাদের এই ব্রাত্য বা শূদ্রত্বজনিত হীনমন্যতা ক্রমশ ঘনীভূত হতে লাগল।

ব্রাহ্মণ্যধর্মে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলনা। এর ফলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দুঃখ থেকে মানবজীবনের মুক্তি লাভের সন্ধানে নিরত হলেন। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ধারায় দুঃখবাদ একটি বিশেষ স্থান লাভ করল। তাই সে যুগের দার্শনিকরা প্রায়ই ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজসভায় মিলিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমালোচনা করতেন। তাঁরা জাতিভেদ সমর্থন করতেন না। তাঁদের সরল জীবনযাত্রা ত্যাগের মহান আদর্শ, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণ্য বিরোধী মনোভাব ও সহজ-সরল ভাষায় জনগণকে উপদেশ দান জনচিত্তকে ক্রমেই আকৃষ্ট করল। ক্ষত্রিয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় ধীরে ধীরে তাদের শক্তিও বেড়ে যাচ্ছিল। ফলে, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেতর গাঙ্গেয় উপত্যকায় যেমন ব্রাহ্মণ বিরোধী ভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল তেমনি এক নতুন সমাজ ও ধর্মদর্শনের সূচনা হল। দেখা যাচ্ছে, 'জ্ঞানমূলক' উপনিষদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে 'যাগযজ্ঞমূলক' ব্রাহ্মণ্যধারার বিরোধী একটি শিবির। আর্যধর্মের 'জ্ঞানকাণ্ড'কে কেন্দ্র করে নতুন ধ্যানধারণা ও চিন্তাজাত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হল। একই সময় ভারতে দুজন ধর্মগুরু বেদের যাগযজ্ঞ ও পশুবলির বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা দুজনেই গাঙ্গেয় উপত্যকার ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হলেন বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম

বুদ্ধ। এঁরা প্রচলিত অর্থে ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করলেও প্রকৃত অর্থে বেদ-বিরোধী ছিলেন না।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের জন্ম হলেও তাঁরা সমসাময়িক ও পূর্বসূরিদের জ্ঞান, কর্ম, ও চিন্তা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। বুদ্ধের বৌদ্ধদর্শন উপনিষদের পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুনঃপুন জন্মলাভের ফলে জীব দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়। মানবজাতির দুঃখনিবৃত্তির উপায় তিনি নির্দেশ করেছিলেন। অবিরত সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ যে অবশেষে দুঃখ নিবৃত্তি লাভ করতে পারে বা পরিনির্বাণ লাভে সমর্থ হয় অর্থাৎ মানুষ তার পরম ও চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে এ ছিল বুদ্ধদেবের কাম্য। উপনিষদীয় ঋষি এই নির্বাণকে বলেছেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান ও হিন্দুযোগীর মতে তা কৈবল্যপ্রাপ্তি।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করলেও বুদ্ধদেব হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের মূল নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় চতুরাশ্রম নীতিরও তিনি সমর্থক ছিলেন। ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস বা যতিহিন্দুর এই তিনটি আশ্রমের আদর্শ ভিক্ষুর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের চতুরাশ্রমে গার্হস্থ্যের স্থান থাকলেও ভিক্ষুদের জীবনে গার্হস্থ্য ধর্মের কোনো স্থানই ছিল না। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর প্রত্যেকটি শ্রমণকে ব্রহ্মচারী হয়ে বিনয়-ব্যবহার শিক্ষা করতে হত। বুদ্ধ বানপ্রস্থকে সর্বজনীন করতে চতুরাশ্রমের মূলনীতিকেই সমর্থন করেছেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্বতন্ত্র ধর্ম নয়, হিন্দুধর্মের সত্তা থেকে এর উদ্ভব ও এর ক্রমবিকাশ। বিদগ্ধ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর বলেছেন— "To my mind ... having approached Buddhism after a study of the ancient religion of India, the religion of the Veda, Buddhism is always seemed to be, not a new religion, but a natural development of the Indian mind in its various manifestations, religion, philosophical, social and political". Rhys David-এর মতে "The founder of Buddhism did not strike out a new system of morals, He was not a democrat; he did not originate a plot to over-throw the Brahmanic priest-hood, he did not invent the order of monk." অন্য একটি বক্তৃতায় Rhys David বুদ্ধকে চিন্তা, কর্মপদ্ধতিতে সামসাময়িক যুগের বিজ্ঞতম ও মহত্তম হিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "The fact we should never forget that Goutam was born and brought up and lived and died a Hindu on the whole, he was regarded by the Hindus of that time as Hindu. He was the greatest and wisest and best of the Hindus and throughtout his career a characteristic Indian."

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা :

সাদৃশ্য (Points of resemblances) :

- (১) উভয় ধর্মই আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী।
- (২) উভয় ধর্মই জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাসী।
- (৩) বৌদ্ধ শিক্ষার ভিত্তি 'সংঘজীবন' এবং ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি 'আশ্রমজীবন'।
- (৪) উভয়েরই আদর্শ ছিল ত্যাগমন্ত্র।
- (৫) সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন ও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের মধ্যে উভয়ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যায়।
- (৬) ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় মুক্তি ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় 'নির্বাণ-এর সাদৃশ্য বর্তমান।
- (৭) উভয় শিক্ষাব্যবস্থাতেই বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান আছে।
- (৮) ব্রাহ্মণদের উপনয়ন ও বৌদ্ধদের প্রব্রজ্যা সমধর্মী—যদিও অনুষ্ঠানগত কিছু পার্থক্য আছে।
- (৯) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তেবাসী জীবন বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রমণ-জীবনের কোনো পার্থক্য নেই।
- (১০) উভয় শিক্ষাব্যবস্থাতেই ভিক্ষায় যাওয়া আবশ্যিক ছিল।
- (১১) সংযম নিয়মানুবর্তিতা ও ব্রহ্মচর্যের ওপর উভয় শিক্ষাব্যবস্থার জোর দেওয়া হত।
- (১২) উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে।
- (১৩) উভয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আবাসিক ও অবৈতনিক।
- (১৪) উভয় ব্যবস্থায় মৌখিক পদ্ধতিকে শিক্ষা দেওয়া হত।
- (১৫) সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক আনুকূল্যের উপরই উভয় শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল।
- (১৬) উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল।
- (১৭) লোকালয়ের বাইরে বিশেষ অনুকূল পরিবেশে উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান করা হত।
- (১৮) উভয় ক্ষেত্রেই শিষ্যপ্রদত্ত গুরু-দক্ষিণা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয়িত হত।
- (১৯) উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

বৈশাদৃশ্য (Points of differences) :

- (১) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল বেদ নির্ভর ও বৌদ্ধশিক্ষা ছিল বেদ বিরোধী কিন্তু উপনিষদ প্রভাবিত।
- (২) বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী কিন্তু বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসী নয়।
- (৩) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের শিক্ষালাভের অধিকার ছিল—বৌদ্ধ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ধনী, দরিদ্র—প্রত্যেকেই

বৌদ্ধশিক্ষার মূলনীতি ও রীতিপদ্ধতি

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল বিহার ও সংঘারামগুলি। এই সমস্ত বিহার ও সংঘারামগুলি মানব সমাজের কোলাহল থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। যাতে ভিক্ষুরা তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কোনোরূপ বাধা না পায়। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে মানুষের আত্মসচেতনতাকে পূর্ণরূপে প্রকাশের চেষ্টা চলতো। তাই বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলিতে বিহার ও সংঘজীবনকে আত্মোন্নতির শ্রেষ্ঠ স্থান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ভারতে বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারামগুলি ছাড়া অন্যত্র কোথাও শিক্ষাদীক্ষার সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সমালোচকের মতে "বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস মূলত বৌদ্ধ-সংঘেরই ইতিহাস। এখানেই আমরা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্য দেখতে পাই।[১]" ঐতিহাসিক গোকুল দাস দে সংঘের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন। (i) It should be situated not far from the villages and not too close to them (ii) it must be easily accessible to the people of towns and villages who wished to go there (iii) it must be free from Commotion by day and noise of animals by night (iv) it must not be very windy (v) and (vi) it should be fit for human habitation and be conducive by meditation.[২]"

প্রব্রজ্যা বা প্রব্রজ্জা ও উপসম্পদা ঃ

সংঘে প্রবেশের নিয়মাবলি বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থে বিনয় ত্রিপিটক গ্রন্থ বর্ণিত আছে। ভিক্ষু সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকারের জন্য ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। যাঁরা ভিক্ষু হতে চান, তাদের

---

১. অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-বৌদ্ধসাহিত্যে ও শিক্ষাদীক্ষার রূপরেখা (ক.বি.) পৃ: ৪৭

২. C D. De - ibid. p. 23

প্রথমেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু উপসম্পদা লাভ না করলে তাদের ভিক্ষু বলে স্বীকার করা হয় না। মূল কথা, প্রব্রজ্যা ভিক্ষুব্রত গ্রহণের সঙ্কল্পের পরিচায়ক আর উপসম্পদা লাভ করলেই ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা লাভ হয়। সকলেই ভিক্ষু হতে পারে না নরঘাতক, দস্যু, সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্রীতদাস, সৈনিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারে না এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করলে উপসম্পদাও লাভ করা যায় না, আর উপসম্পদা লাভ না করলে কেউই ভিক্ষু বলে গণ্য হয় না।

আবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেও যারা গুরুতর অপরাধী, যারা পুরুষত্বহীন, তারা ভিক্ষু হতে পারে না। ভিক্ষুণীদের উপসম্পদা লাভে বেশ কয়েকটি বাধা আছে। আবার শ্রমণেরাও এটি করলেই ভিক্ষু হতে পারে না। পিতামাতার অনুমতি ও নির্দিষ্ট বয়স না হলে শ্রমণেরাও উপসম্পদা লাভের অধিকারী হয় না। মূলকথা প্রব্রজ্যা হল সংসারত্যাগ, যার উপসম্পদা হল প্রব্রজ্যাবলম্বীদের ভিক্ষুধর্মে প্রকৃত দীক্ষা। বৌদ্ধসংঘে প্রবেশের দুটি ধাপ ছিল—প্রথমটি প্রব্রজ্যা ও অপরটি উপসম্পদা। এ দুটি গড়ে তুলত ভিক্ষু জীবন। পনেরো বছরের পূর্বে কেউ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারত না। এবং কুড়ি বছর পূর্ণ না হলে উপসম্পদা লাভ করতে পারত না। প্রব্রজ্যা নেবার আগে কোনো অভিজ্ঞ উপাধ্যায় নির্বাচন করতে হত। তারপর কেশ ও শ্মশ্রুমণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করে সেই উত্তরীয়টি দিয়ে এক কাঁধ আবৃত করে পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে যুক্ত করে উপাধ্যায়ের কাছে তিনবার প্রার্থনা জানাতে হত। (To Come under a teacher the pupil had to observe the following procedure : placing his upper garment on shoulder he should salute the feet of his teacher and squatting on the ground pray unto him with folded hands three times: Revered sir, be my upajjhaya' upon which his teacher would declare in gestures and words 'All right, be my pupail etc. If proper gestures and words were not used, the declaration of the pupil and its acecptance by the teacher would become null and void."[১]

উপাধ্যায় শিক্ষার্থীর কাছে কয়েকটি প্রশ্নের যথোচিত উত্তর পেলে ত্রিশরণ ও দশশীলসহ প্রব্রজ্যা দিতেন। সংঘে গৃহীত হবার পর প্রবেশার্থীকে সংঘের ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করে পদ্মাসনে বসে যুক্তকরে প্রার্থনা জানাতে হত-'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি'-এটিই ত্রিশরণ। এই প্রথম প্রবেশানুষ্ঠানের পর ভিক্ষার্থী বৌদ্ধ শ্রমণরূপে পরিচিত হত। এরপর উপাধ্যায় আবার তাকে চীবর (কাষায় বস্ত্র), পিণ্ড (ভিক্ষান্ন), শয়নাসন (বাসস্থান), ও ভৈষজ্য (ঔষধ)-এচারটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ দেবার জন্য উপদেশ দিতেন। এই চারটি ব্যাপারকে বলা হয় চারটি আশ্রয় (চত্তারো নিস্সয়া পিণ্ডিয়ালোপভোজনং, পংসুকূলচিবরং, রুক্খমূলসেনাসনং, পুতিমুত্তভেসজ্জ অর্থাৎ ভিক্ষান্ন গ্রহণ, ছেঁড়া কাপড় পরা, গাছের তলায় শোয়া ও গোমূত্র ঔষধাদি সেবন) ব্যাপারে নিষেধাদি আরোপ করতেন।

---

১. ibid - P. 23

দশটি শীল হল ঃ

○ (১) পানানিপাতা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—প্রাণীহত্যা হতে বিরতি এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

○ (২) অদিন্নদানা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—অদত্তগ্রহণ (চৌর্য) হতে বিরতি এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

○ (৩) অব্রহ্ম চরিয়া বেরসনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—অব্রহ্মচর্য হতে বিরতি শিক্ষাপদ এ গ্রহণ করছি।

○ (৪) মুসাবাদা বেরসনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—মিথ্যাকথা হতে বিরতি শিক্ষাপদ এ গ্রহণ করছি।

○ (৫) সুরামেরেয়—মজ্জপমা পমাদট্ঠানা সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—সুরা, মেরেয় মদ্যাদি প্রমাদের কারণ হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

○ (৬) বিকালভোজনা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—বিকালভোজন হতে বিরতি গ্রহণ করছি।

○ (৭) নচ্চ গীত বাদিত-বিসুকদস্সনা সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—নাচ, গান, বাজনা ও কৌতুক দর্শন হতে বিরতি গ্রহণ করছি।

○ (৮)মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্ঠানা—বেরমনী...মালাগন্ধ বিলেপনাদি ধারণ ও বিভূষণ হতে বিরতি গ্রহণ করছি।

○ (৯) উচ্চসয়ন মহাসয়না বেরসনী...। —উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা হতে বিরতি...।

○ (১০) জাতরূপ-রজত-পটিগ্ গহনা...। সোনারূপা প্রতি গ্রহণ হতে বিরতি...।

উপসম্পদা (Upasampada) ঃ

সংঘে প্রবেশের পর ভিক্ষু শ্রমণকে নানা রীতি-নীতি মেনে প্রায় বিশবছরকাল সংঘে কাটাতে হত। এই সময়টাই শ্রমণ জীবনের অধ্যয়ন কাল। শ্রমণ জীবনের পরিসমাপ্তিতে সংঘাচার্য শ্রমণকে উপসম্পন্ন ভিক্ষুরূপে বরণ করতেন। এ দিনটি ছিল তার কাছে পরম পবিত্র ও স্মরণীয়।

উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে উপসম্পদা লাভ করতে হত। প্রথমত তাঁকে কোনো একজন উপাধ্যায় নির্বাচন করতে হত। তিনি তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞসা করবেন। প্রশ্নগুলি এরূপ—

○ (১) উপসম্পন্ন ছাত্রটি কি রোগমুক্ত?

○ (২) ছাত্রটির প্রকৃতি কীরূপ? বা কী ধরনের ছাত্র (What kind of man he was?)

○ (৩) সে কি তাঁর বাবা মায়ের অনুমতি নিয়েছে?

○ (৪) তার বয়স কি কুড়ি বছর হয়েছে? (জন্মের তারিখ হিসেবে না ধরে আরও ছমাস অর্থাৎ ভ্রূণ অবস্থা থেকে হিসেব করতে হবে)

○ (৫) তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় পোশাক বা পানপাত্র আছে কিনা?

○ (৬) তাঁর নাম ও তাঁর পিতামাতার নাম কী?

তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। অন্তেবাসীদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ হার্দ্য সম্পর্ক স্থাপন করবেন। বিপদে অন্তেবাসীদের পরিত্যাগ করবেন না। কর্তব্য কার্যে অবহেলায় কোনোরূপ ক্ষমা করবেন না এবং তাদের বিপথগামী দেখলে তাদের সংযত রাখবেন।

বৌদ্ধবিহারে শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ

বৌদ্ধযুগেও জ্ঞানচর্চা চলত মুখেমুখে ও গুরু শিষ্য পরম্পরায়। উপদেশ ছিল মূলত সংঘজীবনের শিক্ষা, সংঘের নিয়মকানুন, ধর্মীয় উপাখ্যান, নীতিমূলক বৌদ্ধজাতক, স্তুতিগানও বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব প্রভৃতি। বিহারগুলিতে সাধারণত ধর্ম বা ধর্মাচার বিষয়ক উপদেশ দেওয়া হত। বিহারগুলি ছিল ধর্মের আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক চর্চার কেন্দ্র। এগুলি আদর্শ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী গড়ে তুলত। অধিকাংশ ভিক্ষুদের সময় কাটত ধ্যানধারণায় ও বাকি সময়টুকু কাটত শিক্ষাদান কার্যে। সংঘের তরুণ শিক্ষার্থীদের আদর্শ ভিক্ষু করে গড়ে তোলার ভার তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। ধীরে ধীরে এই সব বিহারগুলি এক একটি শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল ও পরে সেগুলি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বিহারে শিক্ষানবিশরাই ছিলেন আবাসিক ছাত্র। যারা বাইরে থেকে আসত তাদের শিক্ষা দেওয়া হত দিনের বেলায়। তাদের কাছে বিহার ছিল Day School আর উপাধ্যায়রা ছিলেন প্রাজ্ঞ ও বহুদর্শী। দক্ষ আচার্যরাই পঠনপাঠনে নিযুক্ত থাকতেন। সমপর্যায়ভুক্ত আচার্যদের বিহারে বসবার স্থান ছিল খুব কাছাকাছি। বিভিন্ন বিষয়ের আচার্যদের স্থান নির্দিষ্ট। যে সব গৃহস্থ শিক্ষার্থী থাকত তাদের নাম ও ঠিকানা বিহারের দপ্তরে লিখে রাখা হত। কারণ সংঘের নিয়মানুসারে পরিদর্শক ভিক্ষুর প্রথম বিহারে প্রবেশের সময় গৃহস্থ শিক্ষার্থীদের নানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতেন।

বিহারে দুধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আবাসিক শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও বিনয় সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হত। ত্রিপিটকে নটি বিভাগ ছিল ধর্মোপদেশে পূর্ণ। এই নটি ভাগ হল সুত্ত (সূত্র)—গদ্যে উপদেশ, গেয্য—গদ্যে পদ্যে ধর্মোপদেশ, বেয্যাকরণ (ব্যাকরণ)—ব্যাখ্যা ও টীকা, গাথা (শ্লোক), উদান—সারগর্ভ বচন, ইতিবুত্তক—ক্ষুদ্রভাষণ, জাতক—বুধদেবের পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত, অব্ভুতধর্ম—(অদ্ভুতধর্ম) —অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, এবং বেদাল্ল (প্রশ্নোত্তর ছলে ধর্মোপদেশ)। অপর পক্ষে বিনয়পিটক হল সংঘের নিয়মকানুন সম্বলিত সংগ্রহ গ্রন্থ। সংঘের নিয়মকানুন ও ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য পালনীয় আচার ব্যবহার এতে লিপিবদ্ধ আছে। তাই ভিক্ষুদের বা বৌদ্ধশাসনের পরিশুদ্ধির জন্য বিনয়পিটক একান্ত প্রয়োজনীয়। এর তিনটি ভাগ (১) সুত্ত বিভঙ্গ (২) খন্ধক ও (৩) পরিবার। সুত্তবিভঙ্গ হল বিনয়ের অনুশাসন ও তার ব্যাখ্যা, খন্ধকে সংঘের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ও ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের দৈনন্দিন আচারব্যবহার এবং পরিবার-এ বিনয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রশ্নোত্তরছলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুত্তবিভঙ্গের প্রধান অঙ্গ পাতি মোক্খ বা প্রাতিমোক্ষ। এই প্রাতিমোক্ষ আবার দুপ্রকার—ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ এবং ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় শিক্ষা ও এগুলির ব্যতিক্রমে তাদের যে অপরাধ হয় তাদের দণ্ডের বিধানও এইসব গ্রন্থে

উল্লিখিত আছে। খন্ধক দুভাগে বিভক্ত—মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ। মহাবগ্‌গের ১০টি পরিচ্ছেদ। এর পরিচ্ছেদগুলি বড়ো বলে একে বলে মহাবগ্‌গ এবং এতে বুদ্ধের উপদেশ, সংঘের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশের বিবরণ নিহিত। এতে সংঘের নানাবিধ কার্যাবলি ও তাদের বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে নানা বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। চুল্লবগ্‌গ—১২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এর পরিচ্ছেদগুলি ক্ষুদ্র বলে একে চুল্লবগ্‌গ বলা হয়েছে। এতে ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আচার ব্যবহার বাসস্থান, আসবাবপত্র, প্রায়শ্চিত্ত ও নানা কর্তব্যকর্মের বিধান আছে।

পরিবার পাঠে একুশটি পরিচ্ছেদ। অনেকের মতে এটি সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুদীপ কর্তৃক রচিত। এখানে বিনয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রশ্নোত্তরছলে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে বিষয়টিকে একেবারে সহজ ও সুবোধ্য করা হয়েছে। সুত্তবিভঙ্গ ও খন্ধকের বিষয়গুলি জানবার এটি একমাত্র চাবিকাঠি।

বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ও দক্ষ আচার্যরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের আবৃত্তি করতেন, উপদেশ দিতেন, পরীক্ষা নিতেন ও ধর্মব্যাখ্যা করতেন। যেমন সৌত্রান্তিকগণ সূত্র সংগায়ন করতেন, বিনয়ধরগণ বিনয় মীমাংসা করাতেন এবং ধর্মকথিকগণ ধর্মালোচনা করাতেন। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও স্তরভেদ ছিল। প্রথম স্তরে শিক্ষার্থীরা সূত্রগুলি পুনঃপুন আবৃত্তি করত, দ্বিতীয় স্তরে বিনয় ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করত ও পরের স্তরের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধ্যান মার্গে অবস্থান করে অধ্যাত্মচিন্তার দ্বারা নির্বাণ লাভ করতেন। প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক আবাস নির্দিষ্ট ছিল।

চিন্তাভাবনা ছাড়াও বিহারগুলিতে বিভিন্ন শিল্প ও

মুসলিম শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Muslim Education) ঃ

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মার পরিশুদ্ধিকরণ (purification of the soul) এবং শিক্ষাকে মনে করা হত (a preparation for life and for life after death)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রত্যেকটি ছাত্রের ওপর ব্যক্তিগতভাবে জোর দেওয়া হত। শিক্ষা মূলত ধর্মীয় ও নৈতিক। অবশ্য মোগল সম্রাট আকবর শিক্ষার এই চিরাচরিত লক্ষ্যের কিছুটা পরিবর্তন এনেছিলেন। এর ফলে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা হাত ধরাধরি করে চলতে শুরু করেছিল। মূলত আকবর শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ করতে চেয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মুসলমানদের আগমনের ফলে শিক্ষা সংস্কৃতিতে ঘটে গেল এক বিরাট পরিবর্তন। সুললিত সংস্কৃতের পরিবর্তে এসে গেল পারসি। হিন্দু পণ্ডিতদের বদলে এলো মুসলমান উলেমার দল। বৈদিক স্তোত্র বা সুত্তের ত্রিশরণের পরিবর্তে শোনা গেল কোরানের আয়েৎ বা মহম্মদের হাদিস্।

এখন মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করা হচ্ছে—

(১) **মহম্মদের নীতির অনুসরণ** (Imitation of the principle of Mahammad) : মুসলিম শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহম্মদের নীতি অনুসরণ করে মুসলিম সমাজকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা। মহম্মদের মতে জ্ঞানই হল অমৃত—এছাড়া মুক্তি অসম্ভব। তাই জ্ঞানার্জনই হল মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি বলেছিলেন কর্তব্য-অকর্তব্য, ধর্মবোধ কেবলমাত্র জ্ঞানের সাহায্যে জানা যায়। অতএব প্রত্যেকটি মানব মানবীর মধ্যে জ্ঞান লাভের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা প্রয়োজন।

(২) **ইসলামধর্মের প্রচার** (Spread of Islam) :

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল ইসলামধর্মের প্রচার ও বিস্তার। ইসলাম ধর্মের প্রচার মুসলমানদের কাছে প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। তাই মক্তবগুলিতে কোরান একেবারে শৈশবাবস্থা থেকে পড়ান হত। এবং এর ফলে ছাত্ররা ইসলামধর্মের মূলনীতি শৈশব থেকে জানতে পারতো। মাদ্রাসা গুলিতেও ইসলাম ধর্মের নীতি, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ান হত। মুসলমান শাসকেরা ধর্মীয় নেতাদের ধর্মীয় অনুশাসনে প্রভাবিত হয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের ওপর যথেষ্ট নিষ্ঠাবান হয়ে পড়েছিলেন। তাদের ধারণা ছিল—"শিশুর কাছে তার পিতামাতার শ্রেষ্ঠদান বা উপহার হল তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা-অর্থাৎ ইসলামধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া"। তাই মক্তব প্রতিষ্ঠা করা, মসজিদের সংস্কার সাধন করা প্রভৃতি বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। মুসলমান ফকিররা, শাসকরা ও জনসাধারণ প্রত্যেকেই শিক্ষক ও ছাত্রদের এত শ্রদ্ধা করতেন যে তারা কেউ কেউ কোনো মাদ্রাসার কাছে কবরস্থ হওয়ার আশা পোষণ করতেন। মহম্মদের একটি বাণী ছিল—শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি পবিত্র (ink of the scholar is holier than the blood of the Martyr)। সাধারণ শিক্ষার ওপর ও বিশেষ জোর দেওয়া হত। প্রচণ্ড অন্ধ গোঁড়ামির বশে তারা প্রচুর হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির সংঘারাম, বিদ্যালয় প্রভৃতি ধ্বংস করে মসজিদ ও মাদ্রাসা সজ্জিত করেছিলেন।

(৩) **ইসলামীয় সামাজিক নীতিবাদের প্রচার** (Spread of Islamic social principle) : ইসলামীয় নীতিবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন রীতিনীতি পালন, সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতি-নীতি মেনে চলা মুসলিম শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

(৪) **বৈষয়িক উন্নতি** (Material progress) :

মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষয়িক উন্নতি ও অবহেলিত ছিলনা। মুসলিম শিক্ষার একটি দুর্বলতা ছিল যে এটি নানাভাবে মানুষকে উচ্চপদ লাভের জন্য প্রলুব্ধ করত। কোনও ছাত্রকে তার পতন বা অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করলে তাকে 'জগীর' উপাধিতে

সম্মানিত করা হত। মাঝে মাঝে মুসলিম শাসকরা ছাত্রদের সেনাপতি (সিপাইশালার), কাজী (বিচারক), ভাজির বা মন্ত্রীপদে নিয়োগ করতেন। উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিতদের যথেষ্ট সম্মান দেখানো হত। বিচারক, আইনজ্ঞ, মন্ত্রী প্রভৃতি পদে শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হত। বহু হিন্দু এই সব বড়ো বড়ো পদের লোভে পারসি ভাষা শিখতেন ও উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন। ভবিষ্যৎ জীবনকে উপযুক্তভাবে তৈরি করা ছিল মুসলিম শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৫) রাজনৈতিক সমর্থন (Political support) :

মুসলিম শিক্ষার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। ভারতে এসে নতুন পরিবেশে প্রভাব বিস্তার করতে হলে অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি করতে হয়েছিল, যাতে তারা রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করে।

Merits and demerits of Islamic Education :

মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে প্রায় ছশ বছরেরও বেশি প্রচলিত ছিল। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু মক্তব ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা মিটিয়েছিল। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। বিভিন্ন রাজ্যের শাসকবর্গ এই শিক্ষার বৃদ্ধি ও রক্ষার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। কোনো রাজত্ব চলে যাওয়ার পর তার প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি বেশি দিন স্থায়ী হয় না কিন্তু মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল তা ভারতীয় সমাজজীবনের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল। তবুও সেই শিক্ষার কিছু উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল দিক দেখা যায়। প্রথমে ঐ শিক্ষার উজ্জ্বল দিকগুলি আলোচিত হচ্ছে।

উজ্জ্বলতম দিক (Points of Merit) :

(i) ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় (Harmonisation of secular and religious education) :

ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ই মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ধর্মে মৃত্যুর পর জীবাত্মার দেহান্তের প্রাপ্তি ভাবনা (Metempsychosis) অস্বীকৃত। তাই তাদের পার্থিব সুখ সম্পদ ও সমৃদ্ধির দিকেই আগ্রহ বেশি। সুখের ব্যাপার এই যে, মুসলমান পণ্ডিতরা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতেন। অবশ্য তারা তাদের ধর্মের প্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠানগুলিকেও বাদ দিতেন না। তাই সে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে ধর্মীয় নেতারা বাস্তব জীবনযাপনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও নির্ভরতার উল্লেখ করেছেন। পয়গম্বর মহম্মদ প্রচার করেছিলেন প্রতিটি খাঁটি মুসলমানের উচিত জ্ঞানার্জন করা এবং তিনি তাঁর অনুগামীদের সারাজীবন জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। শিল্পকলা, সাহিত্য, কৃষিবিজ্ঞান, স্থাপত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, বাণিজ্যবিদ্যা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হত। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দিয়েও তার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার জন্য কোরান ও হাদিস্ পড়ানো হত।

(ii) উদ্দেশ্যমূলকতা (Objectivity) :

মুসলিম শিক্ষা কেবল শিক্ষার জন্য শিক্ষা (Education for the sake of Education) ছিল না, বাস্তব জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল। তারা দার্শনিক নাস্তিকবাদে (Nihilism) বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা কর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ও তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বাস্তব জীবন গঠনে কর্মের মধ্যে চালিত করতে চেয়েছিলেন। তাদের কাছে শিক্ষা ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও জীবন নির্ভর করার জন্য নিভীক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর মতে শাহজাদাদের শিক্ষার ভিত্তি হবে ইতিহাস, ভূগোল, শাসন প্রণালী ও রাজনীতি। অন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন তাদের নেই।

(iii) শিক্ষার অপরিহার্যতা (indispensability of Education) :

মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাই ছিল জীবনের অপরিহার্য উপাদান। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে যাঁরা জ্ঞানার্জন করেছেন, তারাই প্রকৃত ভক্ত ও ঈশ্বরের পূজারি। মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের করে উদ্দেশ্য বলেছেন, "জ্ঞান আহরণ কর"। ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়াও পার্থিব জীবন গঠনে শিক্ষার ব্যবহারিক ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। এজন্য বহু ধর্মনেতা, রাজা, রাজপুত্র ও রাজনৈতিক নেতারা জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। পয়গম্বর মহম্মদ আরও বলেছিলেন, যে সব শিক্ষার্থী জ্ঞান লাভ করেন তাদের স্থান হয় স্বর্গে। যতই সে শিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে যায় ততই সে সুখলাভ করে ও তার শিক্ষার জন্য পুরস্কৃত হয়।

(iv) ইতিহাস ও সাহিত্যের অগ্রগতি (Progress of History and Literature) :

ইতিহাস ও সাহিত্যের অগ্রগতি মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিহাস রচনার ওপর জোর দেওয়া হত না, ইতিহাস পাওয়া যেত কিছুটা কিংবদন্তি, লোককথা ও রূপকথা জাতীয় রচনার মাধ্যমে (Legendary and Mythological tales)। মহম্মদের আর্বিভাবের পূর্বে আমরা কালানুক্রমিক ইতিহাস পাই না। কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিনী'কে কোনোমতেই ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। মুসলিম শাসকরা তাঁদের স্মৃতিকথার (Memoirs) মাধ্যমে ইতিহাস লিখে গেছেন। বহু ঐতিহাসিকদের তাঁদের দরবারে ঠাঁই দিয়ে তাঁদের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন। এই সময়কার সাহিত্যে বিলাসবাহুল্য ও মুসলমানদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার ছাপ আছে।

(v) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Relation between the teacher & the taught) :

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক মুসলমান শিক্ষাব্যবস্থার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠত। মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত যত্ন নিতেন। তবে প্রত্যেকটি ছাত্র আপন বুদ্ধিমত্তা অনুসারে শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিত। ঐ সময় কোনো শ্রেণিব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল না। স্বাভাবিকভাবে যোগ্য ও বুদ্ধিমান ছাত্ররা তাদের যোগ্যতা দেখানোর যথেষ্ট সুযোগ পেতেন।